প্রাক্‌কথন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাহিত্যে উপন্যাসই মানবজীবনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী অন্বিত । জীবনের জটিলতা, দ্বন্দ্ব এবং বৈচিত্র্যের সমাবেশে গভীর জীবনবোধের ইঙ্গিত ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য । প্রতিদিনকার জীবনের চারদিকে ঘটনাপ্রবাহ এবং চলমান জনারণ্য আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে নাড়া দিয়ে যায় । তাদের সম্পর্কে বোধ করি অসীম কৌতূহল, আর সেই কৌতূহলই উপন্যাসকে আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচনে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে । কিন্তু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায় । বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাসের সংখ্যার বিপুলতা এবং আমার সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতা বিচার করে প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতির দিকে অগ্রসর হই । সেখানেও সময় এবং পরিধির । শেষ পর্যন্ত বিহারবাসী বাঙালী ঔপন্যাসিকদের কথাসাহিত্যেই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি ।

অধুনা বিহারের অনেক অঞ্চল একদা বাংলার অঙ্গ ছিল । দীর্ঘকাল বিহারীদের পাশাপাশি ঘনিষ্টভাবে বসবাসের ফলে উক্ত বিহারবাসী বঙ্গ-সন্তানদের অন্তর্জীবনে এবং বহির্জীবনে স্বাভাবিকভাবেই একটা স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে যায় । সেই পরিবর্তিতজীবন কোন্ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে এবং সাহিত্যের উপাদান হিসেবে বাঙালী সাহিত্যিকরা সেই সংস্কৃতিকে কতখানি গ্রহণ করেছেন সেই বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে । সেই সঙ্গে এইসব প্রবাসী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে বিহারের জনজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি কতখানি গ্রথিত হয়েছে তাও আলোচনার উপজীব্য বিষয় । আমার গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম: '' বিহার-প্রবাসী বাঙালী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিহারের প্রাকৃতিক পটভূমি ও সংস্কৃতির প্রভাব ।'' এই প্রসঙ্গে বিহার প্রবাসী সাহিত্যিক বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে সে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা থাকা আবশ্যক মনে করি ।

প্রথমত:- যাঁরা কর্মোপলক্ষে বা স্বাস্থ্য রক্ষায় অথবা স্বাধীন উপার্জনের আশায় বিহারে গেছেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, তাঁরা এবং তাঁদের সন্ততিদের বিহার প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত :- যাঁরা বেশ কিছুদিন বিহারে বাস করেছেন, তারপর বিহার ত্যাগ করেছেন — পরে মাঝে মধ্যে এসেছেন — কিন্তু যতদিন থেকেছেন তখনকার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, অনুভূতি সবকিছু তাঁদের সাহিত্যে নিটোলভাবে স্থান লাভ করে স্থায়ী সাহিত্যকীর্তি গড়ে উঠেছে। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'।

তৃতীয়ত :- যাঁদের জন্মস্থান বিহারের কোন অঞ্চল, শৈশব বা কৈশোর সেখানে কেটেছে, বিহারে আংশিক বা পূর্নভাবে শিক্ষা লাভ হয়েছে এবং পরবর্তী শিক্ষালাভের জন্য বিহার ছেড়ে গেছেন, তাঁদেরও বিহার প্রবাসী বাঙালী মনে করা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার বিহারে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন বা কয়েক বছর বসবাস করে অন্যত্র চলে গেছেন।

চতুর্থত :- যাঁরা সরকারী চাকরী উপলক্ষে বিহারে এসেছেন, থেকেছেন, বদলি হয়ে চলে গেছেন। যে সময়টা বিহারে কাটিয়েছেন তখন সাহিত্যচর্চা করেছেন। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে বিহারের পটভূমি এবং বিহারজনপদকে অক্ষয় করে গেছেন।

বিহার প্রবাসী সাহিত্যিক বলতে আমি যেভাবে বুঝেছি এখানে সেভাবেই বলা হল। সাহিত্য সাধক চরিতমালা এইশ্রেণী নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। যথাস্থানে সে আলোচনা করা হবে।

বিহার প্রবাসী বাঙালী লেখকগণের আলোচনা বিভিন্নভাবে হয়েছে। প্রথমত: যাঁরা বিহারে থেকেছেন - অল্পদিন বা বেশী দিন যাই হোক না কেন, তাঁদের তালিকা প্রস্তুত করে নিয়ে তা-অনুসারে তাঁদের সাহিত্যের আলোচনা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ তাঁর

আলোচনায় প্রবাসী বা অপ্রবাসী বিভাগ না করে বিহারের বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখকেই আলোচ্য বিষয় করেছেন। শ্রীমতী কাকলি সর্বাধিকারীর নিবন্ধে এইপ্রকার আলোচনা লক্ষ করা যায়। তিনি সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যে বিহারের পটভূমির অবদান বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

নির্দিষ্ট রচনা আরম্ভের আগে তিনি সেইসব লেখকদের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের সাহিত্য রচনায় বিহারের পটভূমি বা চালচিত্র ব্যবহার করেছেন। গবেষণার কাজে পূর্ণিয়াভ্রমণ উপলক্ষে তাঁর সেই গবেষণা-সন্দর্ভ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাঁরা তাঁদের লেখায় বিহার সম্পর্কে একটি/দুটি বাক্যও লিখেছেন বা বিহার সম্পর্কিত সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন তাঁদেরও তিনি তাঁর নিবন্ধে যুক্ত করেছেন। আমি সেরকম লেখাকে বিহারের পটভূমিতে লেখা বলে স্বীকার করতে সম্মত নই। এই সারণীভুক্ত লেখকরা সকলেই বাঙালী - কিন্তু সকলে প্রবাসী নন। আবার এঁদের মধ্যে কবি, কথা-সাহিত্যিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক সকলেই আছেন। কাজেই মূল বিষয়ে তো বটেই, তাঁর উক্ত অধ্যায়ও আমার গবেষণা-বিষয় থেকে মূলতঃ পৃথক।

এ ছাড়া দু/একজন বিহার-প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকের একক আলোচনা গবেষণা-মূলকভাবে হয়েছে — কোথাও আঙ্গিক ও ভাষা নিয়ে, কোথাও বিষয়বস্তু নিয়ে। তবে কোন আলোচনাই অনুপুঙ্খ নয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমার আলোচনায় একান্ত বিহার-প্রবাসী বাঙালী ঔপন্যাসিকদের নির্বাচন করেছি এবং সেইসব ঔপন্যাসিকদের, যাঁদের লেখায় বিহারের ভূ-প্রকৃতি, জনগণ, জনগণের ভাষা, রীতিনীতি, সংস্কার-কুসংস্কার প্রধান উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আমার আলোচনার পরিধি এবং আয়তন সীমিত রাখার জন্য এবং অনুপুঙ্খ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সীমাবদ্ধতা। ঠিক এ ধরনের আলোচনা আমি এর আগে দেখিনি।

আমার 'একান্ত' শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হিসেবে, এটাই যুক্তি যে, যাঁরা বিহারের প্রবাসী বাঙালী নন অথচ তাঁদের উপন্যাসের পটভূমি সম্পূর্ণভাবেই বিহার তাঁরা আমার আলোচনার তালিকাভুক্ত নন। রমাপদ চৌধুরী এবং সুমথনাথ ঘোষ এই গোষ্ঠীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রমাপদ চৌধুরীর 'অরণ্য আদিম', 'সুজন', 'তিনতারা' এবং সুমথনাথ ঘোষের 'উত্তরবাহিনী', বনরাজিনীলা পাঠ করলে তাঁদের বিহারবাসী বাঙালী না ভেবে পারা যায় না। আমারও ধারণা তাই হয়েছিল। কিন্তু ভুল ভাঙ্গে শ্রী রমাপদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। গত ১৪।১০।'১২ তারিখে আমি রমাপদবাবুর সঙ্গে কলকাতার আনন্দবাজার অফিসে দেখা করে জানতে পারি, তিনি আদৌ বিহারের প্রবাসী বাঙালী নন। অনেকবার বিহারের নানাস্থানে বেড়াতে গেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর লেখায় অমর সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। একইভাবে ভুল ভাঙ্গে মিত্র ও ঘোষ কোম্পানীর কর্তা-সাহিত্যিক অফিসে শ্রী সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। তিনি জানান সুমথনাথ ঘোষ কোনদিন বিহারের অধিবাসী ছিলেন না। অসুস্থ অবস্থায় মধুপুরে; শিক্ষকতায় ছিলেন। গ্রন্থ-ব্যবসায় উপলক্ষে বিহারের পাটনা, ভাগলপুরে গিয়েছেন অনেকবার — পথচলার কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর রচিত উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

এ গবেষণা-কার্যের তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সুনামধন্য সাহিত্যিক ডঃ অশ্রুকুমার শিকদার। আমার অভিসন্দর্ভের নির্দেশনায় তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর অকৃপণ সাহায্য এবং সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমার এ কাজ সম্পূর্ন হত না। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এ গবেষণা-নিবন্ধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি সেগুলোর মধ্যে কলকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ির আজাদ হিন্দ পাঠাগার, জেলা গ্রন্থাগার, চলন্তিকা পাঠাগার, বাবুপাড়া পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, পূর্নিয়ার ইন্দুভূষণ পাঠাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গবেষণার কাছে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ।

প্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায় । তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়ে এবং সর্বরকমে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । এ ছাড়া তিনি লেখক শ্রী বিমল করের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন ।

শ্রী বিমল কর এবং শ্রী রমাপদ চৌধুরী তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করেছেন, তার জন্য তাঁদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা । সুরথনাথ ঘোষ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করার জন্য কথা -সাহিত্যের সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ ।

পূর্নিয়ার অনেকের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে পড়ে শ্রী সুবল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা । তিনি পত্রযোগে নানা উপদেশ দিয়ে এবং যোগাযোগে সাহায্য করে আমাকে ঋণী করেছেন । পূর্নিয়াবাসী শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রী আশিস কুমার দে এবং শ্রী নীতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্নিয়ায় অবস্থানের সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন । শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্নিয়ার 'দাদামশাই' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র । তিনি যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সময় দিয়েছেন — আমাদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন — ওঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাওনা' উপন্যাসটি পড়তে দিয়েছেন [তখনও কেদার রচনাবলীর (১ম খন্ড ব্যতীত) মুদ্রণ হয়নি]। দাদামশায়ের ঘরে রক্ষিত একটি দুর্লভ Photograph -এর ছবি নেবার অনুমতি দিয়েছেন এবং দাদামশায় এবং সতীনাথ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন । ওঁর বাড়ীর প্রায় মুখোমুখি বাড়ীতে থাকেন সরবেশগঞ্জ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী নীতীন বন্দ্যোপাধ্যায় । যে কদিন পূর্নিয়ায় ছিলাম প্রত্যেকদিনই

কোন না কোন উপলক্ষে ওঁর কাছে গেছি — সর্বদা সহৃদয়চিত্তে আপ্যায়ন করেছেন এবং সতীনাথ, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর -এঁদের সম্পর্কে বহু রকম আলোচনা করেছেন।

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত বর্তমানে পূর্ণিয়ার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের সময়ে গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চিত্তবাবুর পিতা রায়বাহাদুর তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের বাড়ীতেই সমবেত হন। যে বাড়ীতে বসে কথা হচ্ছিল সে বাড়ী ২০০ বছরের পুরোনো বাড়ী। সম্ভবতঃ এই বাড়ীতেই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নেতাদের পদধূলি পড়েছিল। চিত্তবাবুর বাড়ীতে একটি তাৎমা ছেলের সঙ্গে আলাপ করলাম। কথা ভাল বুঝতে পারছিলাম না — ওঁরা বুঝিয়ে দিলেন। ''ঢোঁড়াইচরিত মানসে''র তাৎমাটুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি — শুধু একটা স্কুল হয়েছে। চিত্তরঞ্জনবাবু সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে একই টেবিলে বসে কাজ করেছেন। শ্রী আশিস কুমার দে পূর্ণিয়ার একজন সাংবাদিক এবং আইনজীবী। তিনি বৃষ্টিবাদল তুচ্ছ করে আমাদের ইন্দুভূষণ পাঠাগারে নিয়ে গেছেন — পাঠাগারের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং ইন্দুভূষণ পাঠাগার ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা ছাড়া শ্রীমতী কাকলি সর্বাধিকারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গত ১০।১।৯০ তারিখে সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ী (অট্টাবাজার, পূর্ণিয়া) দেখতে যাই। এখন সেখানে থাকেন অশোক দোকানিয়া। তাঁর বাবা বেগরাজ দোকানিয়া ১৯৬৮ সালে ভূতনাথ ভাদুড়ীর কাছ থেকে ঐ বাড়ী কিনে নেন। স্থানীয় শিক্ষিত অধিবাসীদের মনে এ বিষয়ে আক্ষেপ আছে — তাঁরা চেয়েছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ীদের বাড়ী সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে সতীনাথের স্মৃতি-সংগ্রহশালা হিসেবে রক্ষা করা হোক। যাই হোক, অশোকবাবু আমাদের সম্পূর্ণ বাড়ীটা ঘুরিয়ে দেখালেন। তাঁকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন — তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়,
জলপাইগুড়ি

কল্যাণী রায় (বিশ্বাস)
{ কল্যাণী রায় (বিশ্বাস) }